পত্রিকা উপদেষ্টা মণ্ডলী

ড. পাচু রায়
শ্রী দীপক কুমার দাঁ
সব্যসাচী চাট্টোপাধ্যায়
কমল বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞান অন্বেষক

মো ঃ ৯৩৩২৮০৬০২
১ ঘণ্টায় রঙিন (ডিজিটাল) ছবি
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর. পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বর্ষ -৭ | সংখ্যা - ২ | মার্চ-এপ্রিল /২০১০ | RNI No. WBBEN/03/11192 | দাম ১ টাকা

মুড়িতে ইউরিয়া

সাবধান!

আমরা বাঙালিরা ভাতের মত মুড়িতেও বেশ ভক্ত। জল-খাবারের সময় মুড়ি একটি উপাদেয় খাবার বলেই বিবেচিত। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে তো বটেই। শহরের মানুষ পরিমাণে সামান্য কম মুড়ি খান। মুড়ি বানাতে বিশেষ ধরনের 'সিদ্ধ চাল' (যাকে মুড়ির চাল বলে) ব্যবহার করা হয়। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় এই চাল ভিজিয়ে, শুকিয়ে, গরমে ভেজে মুড়ি তৈরি হয়। ভেজানোর সময় নুন আর সামান্য খাবার সোডা ব্যবহার হয়। নুন খাবারটিকে সামান্য নোনতা বানায় আর খাবার সোডা কিছুটা ফোলায়। এই পদ্ধতিতে তৈরি মুড়ি সাইজে কিছুটা ছোট ও লালচে হয়। মুড়ি তৈরির এই সনাতন পদ্ধতি চলছিল বহুকাল ধরেই। এখন মুড়ি প্রস্তুতকারকেরা বাদ সেধেঁছেন এই সাবেকি ঘরানার মুড়িতে। ব্যবসায় লাভের অঙ্ক বাড়ানোর খাতিরে তারা কুদৃষ্টি ফেলছেন এই মুড়ির ওপরে। ধবধবে সাদা, বড় ও ফুলকো মুড়ি বানাতে মুড়ির চালকে এখন শুধুমাত্র নুন নয়, মেশাচ্ছেন মারাত্মক স্বাস্থ্যহানীকর ইউরিয়া

এরপর 6 পাতায়

ডারউইনের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং বিশ্বের জনমানসে তার প্রভাব

২০০৯ সালটি আধুনিক বিজ্ঞান ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দুইভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, এই সালটি প্রকৃতি বিজ্ঞানী 'রবার্ট চার্লস ডারউইনের' দুই শততম জন্মবর্ষ — অপরদিকে মূলতঃ তারই রচিত বিশ্ব বিখ্যাত প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব (Theory of Natural Selection প্রকাশনার ১৫০তম বর্ষপূর্তি।

মনে হয় এককভাবে কোন ব্যক্তিবিশেষ তাঁর অবদানের ভিত্তিতে আধুনিক বিশ্বমানুষের বৌদ্ধিক ও সামাজিক জীবনে এতটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি — যা 'রবার্ট চার্লস ডারউইনের' পক্ষে সম্ভব হয়েছে। 'চার্লস ডারউইনের' দ্বি-শততম জন্ম বর্ষে প্রকৃতি বিজ্ঞানে তাঁর যে অসামান্য অবদান যা কিনা সাধারণ মানুষের প্রাকৃতিক বিশ্ব ও পৃথিবীতে মানব প্রজাতির অবস্থান বিষয়ে ধারণার যে পরিবর্তন এনেছে — তা প্রতিফলিত করাই সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক হবে। আধুনিক বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ে ডারউইনের যে বিশ্বদৃষ্টি যা কিনা তাঁর সারাজীবনের গভীর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফসল জনমানসে তা বিস্তারের এটাই উপযুক্ত সময়। ২০০৯ সালকে সারা বিশ্বব্যাপী 'আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও মানবিকতা উদ্‌যাপন বর্ষ' (International Celebration of Science & Humanity) হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রবার্ট চার্লস ডারউইনের জন্ম ১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের এক ধনী পরিবারে। তাঁর মাতামহ 'ওয়েজউড্' চীনা মৃতপাত্র সম্পর্কীয় এক নামকরা ব্যবসায়ী ছিলেন। পিতামহ 'এবাসমাস ডারউইন' ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম একজন। পিতা 'রবার্ট ওয়ারিং ডারউইন' ছিলেন একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক। শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই 'চার্লস ডারউইন' প্রথাগত শিক্ষায় একেবারেই আগ্রহী ছিলেন না। মাতৃহীন অবস্থায় প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘুরে বেড়ানো এবং কীটপতঙ্গ পর্যবেক্ষণ, সংগ্রহ ও শিকার এই সমস্তই ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়। সাধারণ শিক্ষায় অনাগ্রহী 'চার্লস ডারউইন'কে শ্রুস্‌বেরির স্কুল শিক্ষা শেষে তাঁর পিতা পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রাখার লক্ষ্যে এডিন্‌বার্গে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ণের জন্য পাঠান। সেখানে অস্ত্রপ্রচারের বীভৎসতা দেখে ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দেন। এমত অবস্থায় পিতা 'ওয়ারিং ডারউইন ভীষণ চিন্তিত হয়ে উঠেন

এরপর 2 পাতায়

বেতার তরঙ্গের কথা

দৃশ্যমান আলো একধরনের তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ আরো আছে। শূন্য মাধ্যমে তাদের সকলের বেগ একই। পার্থক্য কেবল তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে তথা কম্পাঙ্কে। তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ পরিবারের এক প্রান্তে রয়েছে দীর্ঘ বেতার তরঙ্গ (Radio Wave)। তারপর ক্রমশ কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের শর্ট ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড, দৃশ্যমান আলো, অতিবেগুনী রশ্মি, এক্স-রে এবং গামা-রে।

স্কটল্যান্ডের বিজ্ঞানী জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (১৮৩১-১৮৭৯) ১৮৬৪ সালে তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণের সূত্রগুলি প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি দেখালেন, আলোর বেগ আলোর উৎসের বেগের উপর নির্ভর করে না এমনকি পর্যবেক্ষকের অবস্থা। তার স্থিতি বা গতির উপরও নির্ভর করে না। ম্যাক্সওয়েল ছিলেন তাঁর সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে। বেতার তরঙ্গ প্রস্তুত বা আবিষ্কৃত হওয়ার আগেই তিনি এমন কতকগুলি সূত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেগুলি বেতার তরঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু সে সময় অনেক প্রথিতযশা বিজ্ঞানীও তাঁর সূত্রগুলি মানতে চাননি। ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণগুলির

এরপর ৪ পাতায়

ডারউইনের সৃষ্টিতত্ত্ব

1 পাতার পর

এবং শেষমেশ তাঁকে কেমব্রিজে পাঠান সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মীয় তত্ত্ব চর্চার জন্য। ভাল না লাগায় কেমব্রিজের শিক্ষাকাল অসমাপ্ত রেখে মাঝপথেই সেখান থেকে বাড়ি ফিরে আসেন। কেমব্রিজে থাকাকালীন দুইজন ব্যক্তির সাথে চার্লস ডারউইনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। তাঁরা হলেন ভূতত্ত্বের অধ্যাপক 'রেভারেন্ড অ্যাডাম সেজউইক' এবং উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক জন হেনস্লো। তাঁদের সহচর্যে ডারউইন প্রকৃতিবীক্ষণে আরও বেশী আগ্রহী হয়ে উঠেন। পরবর্তীতে অধ্যাপক হেনস্লো এর সহযোগিতায় 'ডারউইন' দি এইচ এম্ এস্ বিগল নামের নৌবাহিনীর এক সার্ভের কাজে নিয়োজিত জাহাজে অবৈতনিক প্রকৃতিবিদ পদে যোগদানের জন্য ডাক পান। উক্ত জাহাজটি কিছুদিনের মধ্যেই দক্ষিণ আমেরিকা সহ দক্ষিণ গোলার্ধের বেশ কিছু এলাকায় নানা ধরনের জরীপের কাজ চালানোর লক্ষ্যে রওনা হওয়ার কথা। প্রস্তাবিত কাজে পুত্রের যোগদান বিষয়ে পিতার প্রাথমিক পর্যায়ে ভীষণ আপত্তি থাকলেও শেষমেশ নানা সংশয়ের মধ্যেই অনুমতি দেন।

১৮৩১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে এইচ এম এস বিগল জাহাজ জরীপের কাজে যাত্রা শুরু করে। অভিযান চলে দীর্ঘ ৫ বৎসর ধরে (১৮৩১-১৮৩৬) পরিক্রমারত বিগল জাহাজে ডারউইনকে যে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা হল — উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ এবং ভূ-তাত্ত্বিক নমুনা সংগ্রহ। এই সময়েও কিন্তু ডারউইনের ধারণা ছিল সকল প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি সমূহ ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং অপরিবর্তনীয়। ১৮৩২ সালে বিগল জাহাজ যখন ব্রাজিলের বহিয়া শহরে পৌঁছে নোঙর ফেলে সেখানেই তিনি টেক্সোডন নামের অবলুপ্ত এক প্রাণীর মাথার ফসিল ও অবলুপ্ত মেগাথেরিয়ামের চোয়াল খুঁজে পান। প্রায় দুই বছর ধরে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলে জরীপের কাজ চলাকালীন নিজে মূল ভূ-খন্ডে থেকে বিভিন্ন স্থানের বৈচিত্রময় ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যেমন দেখেছেন তেমনি বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন্ত ও ফসিলের নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলির ব্যবচ্ছেদের কাজ সহ নিয়মিত নোট লিখতেন ও জীববিদ্যা ও ভূ-বিদ্যা বিষয়ক নানা ধরনের বইপত্র পড়তেন। ১৮৩৫ এর সেপ্টেম্বর মাসে জাহাজ পৌঁছল গ্যালাপেগাস্ দ্বীপপুঞ্জের চ্যাথাম দ্বীপে। সেখানে বিশালাকার কচ্ছপ ভিন্ন আকৃতির গিরগিটি ডলফিন, সিল মানুষকে ভয় না পাওয়া পেঙ্গুইন ধরনের পাখি সহ নানা ধরনের জীবজন্তু দেখতে পান। এর সাথে বিভিন্ন দ্বীপের গাছপালা, জীবজন্তু ও মাছেদের প্রকৃতি ও অভ্যাসের বিভিন্নতা তাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করে। এই সময়ই বিভিন্ন ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দ্বীপে মোট ১৩ জাতের চড়ুইপাখির সন্ধান পান। যাদের ঠোঁটের গড়ন ছাড়া এরা প্রায় একইরকম দেখতে। খাদ্যাভ্যাসের বিভিন্নতার কারণেই এইসব প্রজাতির উদ্ভব। এইরকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে 'ডারউইনের' মনে প্রশ্ন জাগে খাদ্যাভ্যাসের বিভিন্নতার কারণেই কি তাহলে প্রজাতি বদলায়? চড়ুইগুলো তবে কি নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? তাহলে বিশেষ কেউ কি তাদের সৃষ্টি করেনি? চড়ুইদের ক্ষেত্রে যদি এটাই সত্য হয় তবে অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে তা মিথ্যা হবে কেন? এই সমস্ত প্রশ্ন মাথায় রেখে তাঁর সংগৃহীত নমুনা ও ২৪টি নোটবুক সহ ১৮৩৬ এর ২রা অক্টোবর তিনি ইংল্যান্ডের ফলমার্ভথ বন্দরে ফিরে আসেন। ১৮৩৯ সালে ভয়েজ অব দি বিগল নামে ডারউইন একটি জার্নাল প্রকাশ করেন যা আজও শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ বিষয়ক রচনা বলে পরিচিত।

পরবর্তী দীর্ঘ ৮ বছর ধরে তিনি চিলির সমুদ্র উপকূল থেকে সংগৃহীত সিরিপিডা নিয়ে গবেষণা করেন। এই সময় ব্যবচ্ছেদ করেন প্রায় ১০ হাজার নমুনা। ১৮৪২ সালে প্রজাতির উদ্ভব বিষয়ে ৩৫ পৃষ্ঠার একটি রূপরেখা তৈরী করেন। ১৮৪৪ সালে সেটিকে বর্দ্ধিত করে ২৩০ পৃষ্ঠার একটি পান্ডুলিপি তৈরি করেন এবং তা ভূবিদ 'চার্লস লায়েল' ও উদ্ভিদবিদ 'হুকারকে' তাদের মতামতের জন্য পাঠান। এঁদের দুজনেই বিশ্বাস করতেন — প্রজাতি ঈশ্বরসৃষ্ট এবং অপরিবর্তনীয়। যার ফলস্বরূপ এরা তা প্রকাশে আপত্তি জানান। এইরকম পরিস্থিতিতে জনসংখ্যার নীতি বিষয়ক টমাস ম্যালথাসের একটি প্রবন্ধ ডারউইনের হাতে আসে এবং সেটিকে ভাল করে পড়ে ফেলেন। লেখকের মতে জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে এবং এই হার প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম ঘটনাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই তত্ত্ব ডারউইনকে নিজের তত্ত্বের বাস্তবতা প্রমাণ করতে উৎসাহী করে তোলে। যে সময় ডারউইনের প্রজাতির উৎপত্তি বিষয়ে তাত্ত্বিক গ্রন্থটি পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির পথে সেই সময় অর্থাৎ ১৮৫৮ সালের ১৮ই জুন 'আলফ্রেড রবার্ট ওয়ালেসের' তাঁকে লেখা একটি চিঠির সাথে একটি প্রবন্ধ তিনি পেলেন। প্রবন্ধটির শিরোনাম — 'আদি প্রকরণ থেকে উদ্ভূত জাতগুলির অনির্দিষ্টভাবে পৃথক হওয়ার প্রবণতা। চিঠিতে তিনি ডারউইনকে অনুরোধ করেছিলেন প্রবন্ধটি উপযুক্ত মনে হলে সেটি 'চার্লস লায়েলের' মাধ্যমে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক পত্রিকায় প্রকাশে তিনি যেন সচেষ্ট হন। 'ডারউইন' অতি আগ্রহের সাথে 'ওয়ালেসের' প্রবন্ধটি পড়েন ও আশ্চর্য্য হন এই কারণে যে বিগত ২০ বছর ধরে যে বিশেষ ধারণাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চর্চায় নিমগ্ন সেই একই তাত্ত্বিক ধারণা 'ওয়ালেস' উক্ত প্রবন্ধে পোষণ করেন। ঐ বছরই 'ডারউইন' এবং 'ওয়ালেস' তাদের আবিষ্কার বিষয়ে এক যৌথ ঘোষণা প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে 'ডারউইন' ১৮৫৯ সালে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির উদ্ভব (The Origin of Species by Means of Natural Selection) বইটি প্রকাশ করেন।

প্রজাতির উৎপত্তি বইটিতে মুখ্যত যা বলা হয়েছে তা হল জীবমাত্রই জ্যামিতিক হারে সংখ্যায় বাড়তে থাকে। কিন্তু জীবন ধারণের উপায়গুলো সাধারণত সেই হারে বাড়ে না। ফলে দেখা দেয় প্রচন্ড সংঘাত। এই সংঘাত হতে পারে একই প্রজাতির বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে বিশেষকরে খাদ্য, আবাসস্থল সহ আরও কিছু কারণে। তেমনি আবার বিভিন্ন প্রজাতির সদস্যদের মধ্যেও পরিবর্তিত আবহাওয়া এবং পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার সংগ্রামে। যারা সর্বশেষ জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে পারে তারাই যোগ্যতম বলে বিবেচিত হয়।

প্রকৃতিতে বিরাজমান যেকোন উদ্ভিদ বা প্রাণী প্রজাতিকে এক একটি জনগোষ্ঠী বলে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ জনগোষ্ঠী হচ্ছে উদ্ভিদ বা প্রাণীদের দল। যেকোন একরকম একটি

এরপর ৩ পাতায়

ডারউইনের সৃষ্টিতত্ত্ব

2 পাতার পর

দলে প্রত্যেকটি প্রাণীর অন্য সব প্রাণী থেকে কোনও না কোনভাবে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন চেহারায়, খাদ্য সংগ্রহের ক্ষমতায়, খাদ্য সম্ভার হজম করার শক্তিতে, শিকার ধরার পদ্ধতিতে, শত্রুকে এড়িয়ে যাওয়ার দক্ষতায়, প্রজনন ক্ষমতায় প্রভৃতির এক বা একাধিক দিক থেকে। এই সমস্ত পার্থক্যের এক বা একাধিক কারণ কাউকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করছে কিন্তু অন্যকে করছে না। ধরা যাক কোনও এলাকায় তৃণভোজী প্রাণীর একটি দল বিশেষ ধরনের কিছু লতাপাতা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। কোনও কারণে একসময় ঐসকল লতাপাতা কমে গেল বা ফুরিয়ে গেল। ঐ দলের মধ্যে যারা বিকল্প খাদ্য হিসাবে নতুন ধরনের লতাপাতায় অভ্যস্ত হল তারাই বেঁচে থাকল। অন্যরা হয় অন্যত্র চলে যাবে অভ্যস্ত খাদ্যের সন্ধানে নতুবা সেখানেই মারা যাবে। যারা বেঁচে থাকল প্রকৃতি তাদের নির্বাচন করল। প্রকৃতিতে যারা নির্বাচিত চিরদিন তারাও একই অবস্থায় থাকতে পারে না।

পরিবেশের ভৌত গুণাবলী যথা উষ্ণতা, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা প্রভৃতি যা কিছু জীবনের নিয়ন্ত্রক, সময় সাপেক্ষে এইগুলিরও পরিবর্তন ঘটে। কোনও সময় যে সমস্ত পার্থক্য প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে কালের ব্যবধানে অন্য ধরনের পার্থক্যও একই ভূমিকা নিতে পারে। সুতরাং যারা আদি প্রাণী হিসাবে বিবেচিত, সময়ান্তরে নানা ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তারাই এক একটি রূপান্তরিত দল বা উপপ্রজাতি রূপে আবির্ভূত হয়। রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা যাদের আছে সেইরকম কোন একটি দলের পক্ষে চিরকাল একই জায়গায় থাকা সম্ভব হয় না। সংখ্যা বৃদ্ধি বা অন্যকোন জৈবিক কারণে নতুন আবাসস্থলে চলে যেতে বাধ্য হয়। এইভাবে আদি দলের সদস্যরা নতুন নতুন বাসস্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। নতুন আবাসস্থলের দলগুলি উপপ্রজাতি পর্যায়ে পরিণত হয় এবং আদি দলের সাথে আর কোনও যোগাযোগ থাকে না এবং এইসময় এরাই নতুন প্রজাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

'ডারউইনের' পিতামহ বা পূর্বসূরী 'ল্যামার্কের' অভিমত ছিল — বিভিন্ন প্রজাতির (উদ্ভিদ বা প্রাণী) দেহে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার তাগিদে উদ্ভব হয় নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য। এই নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। 'ডারউইন' এই তত্ত্বের বিরোধিতা করে বললেন বিভিন্ন জীব প্রজাতির নতুন প্রজন্মে কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় নির্দিষ্ট কোনও উদ্দেশ্য ছাড়াই কেবল মাত্র প্রকৃতির খেয়ালে। পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার কারণে একটি বৈশিষ্ট্য যদি কিছু বাড়তি সুবিধা দেয় তাহলে — যেসকল শাবক সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মেছে তারাই টিকে থাকতে পারে। পরবর্তিতে এরাই নতুন প্রজাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। অসুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য নিয়ে যারা জন্মায় তারা পারিপার্শ্বিকের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। ফলে তাদের অবলুপ্তি ঘটে। যেমন প্রকৃতির খেয়ালেই আদিম খাটো গলা বিশিষ্ট জিরাফ কিছু লম্বা গলা বিশিষ্ট শাবকের জন্ম দেয়। অন্য খাটো গলার শাবকদের তুলনায় লম্বা গলাযুক্ত শাবক বেশি খাবার পেত। ফলে তাদের শারীরিক বিকাশ ঘটত দ্রুত এবং বংশ বিস্তারের হারও বৃদ্ধি পেত। নতুন প্রজন্মের শাবকেরা জন্মাত লম্বা গলা বিশিষ্ট হয়ে। এইভাবেই একসময় খাটো গলা বিশিষ্ট শাবকেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ডারউইনের মতে এই ঘটনায় পরিবর্তিত প্রজাতির নিজস্ব কোন ভূমিকা থাকে না — সবটাই প্রকৃতির খেয়াল নির্ভর। পরবর্তিতে DNA এর গঠন ও ভূমিকা বিষয়ে যেসমস্ত গবেষণা হয়েছে তা ডারউইনের তত্ত্বকে পুষ্ট করেছে এবং বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্যাদা দিয়েছে।

ধর্মের ধ্বজাধারীরা যুক্তি প্রমাণের ধার ধারেন না। এঁদের লক্ষ্যই হল অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসকে জনমানসে টিকিয়ে রাখা, তা সে যেকোনও ভাবেই হোক। যার পরিণতিতে 'ব্রুনোকে' অগ্নিকুণ্ডে জীবন দিতে হয়েছিল। ১৬০০ খৃস্টাব্দে গ্যালিলিওকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে তার এই মতবাদ ভুল বলে। ডারউইনের বিরুদ্ধেও তাঁরা শুরু করলেন অকথ্য আক্রমণ। কারণ তিনি জীবনের উদ্ভব বিষয়ে তাঁদের (ধর্মগুরুদের) সবরকম আজগুবি তত্ত্বের ভিত্তিমূলে কঠোর আঘাত করেছেন। তবে ডারউইনের বিরুদ্ধে ধর্মগুরুদের সবরকম চক্রান্ত ব্যর্থ হয় বিশেষতঃ 'টমাস হাক্সেল', হেকেল, ওয়স প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সক্রিয় ভূমিকায়। এঁরা ডারউইনের সৃষ্টিতত্ত্বের সমর্থনে বহু যুক্তি ও প্রমাণ হাজির করেন।

ডারউইনের সৃষ্টিতত্ত্বের বিরুদ্ধাচরণ পরবর্তীতেও থেমে থাকেনি। বিংশ শতাব্দীতে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে বিজ্ঞান নির্ভর আধুনিক সভ্যতার যুগেও এমন কিছু ভয়াবহ ঘটনাবলী অধিকাংশ ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ মানুষ মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের ধারণা হয় বিজ্ঞানশাস্ত্র মানুষের মূল্যবোধকে অস্বীকার করে। বিবর্তনবাদে প্রাণী ও উদ্ভিদের উৎস সম্পর্কে জানা গেলেও সৃষ্টিতত্ত্বে ঈশ্বরের ভূমিকা বিষয়ে কোনরকম উল্লেখ না থাকা এবং মানুষের উদ্ভব বানর প্রজাতি থেকে — এইসমস্ত ভাবনা সাধারণ মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করার সাথে সাথে এই তত্ত্ব নীতিজ্ঞানহীন স্বার্থপর বলে মনে হতে থাকে। অনেকেই তখন বিজ্ঞান বিরোধী হয়ে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য একটি মামলার কথা বলা যেতে পারে। ১৯২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসিতে এক বিদ্যালয় শিক্ষক তার জীবন বিজ্ঞান ক্লাসে বিবর্তনবাদ পড়িয়েছেন এই অপরাধে তাকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটি ঐ বছরের মার্চ মাসে জারি হওয়া একটি আইনের বিরুদ্ধাচরণ বলে মনে করা হয়। আইনটিতে মূলতঃ বলা হয়েছিল ডারউইনের 'বিবর্তন তত্ত্ব' কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত বা ঐ বিষয়ে শিক্ষাদান করা শাস্তিমূলক অপরাধ বলে বিবেচিত হবে যদি তা বাইবেলে উল্লিখিত সৃষ্টি সম্পর্কে ঐশ্বরিক মতবাদ বিরোধী হয়। উক্ত মামলার প্রধান অভিযোগকারী ছিলেন উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান। বিচারে অভিযুক্ত শিক্ষকের ১০০ ডলার জরিমানা হয়। নাগরিক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী একটি সংগঠন শিক্ষকের সমর্থনে এগিয়ে এসে জরিমানার টাকা দিয়ে দেয় এবং সিদ্ধান্ত নেয় এই বিচারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করবেন। কিন্তু তার আগেই পদ্ধতিগত কারণে শাস্তির রায় বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু মামলার অভিযোগকারী হিসাবে ব্রায়ান ব্যাপক জনসমর্থন পান জনমানসে এর যথার্থতার বিচারে। ধর্মবাদীদের উদ্যোগে গড়ে তোলা হয় এমন একটি সংগঠন যার মুখ্য উদ্দেশ্য হল ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুশাসনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা। এখনও বহু আমেরিকানদের কাছে বিবর্তনবাদ ঈশ্বর বিরোধিতার নামান্তর।

এরপর আগামী সংখ্যায়

কোপেনহেগেন ছাড়িয়ে মেক্সিকো

পরিবেশ সমস্যার সমাধান কি আদৌ কোনদিন হবে?

সমস্যা তো শুধু পরিবেশের নয়, সমস্যা আসলে আমাদের বেঁচে থাকার, আমাদের অস্তিত্বের আমাদের ভবিষ্যতের। আর আমাদের ভবিষ্যতের প্রশ্ন যেখানে জড়িত সেখানে পৃথিবীর সমস্ত দেশই যে কোপেনহেগেন সম্মেলনের দিকে তাকিয়ে ছিল সেটা বুঝতে কোন পরিবেশ বিজ্ঞানী হবার প্রয়োজন নেই। কারণ আমাদেরই পৃথিবীই যে অস্তিত্ব সংকটের আশঙ্কায় দিন গুনছে। তাই ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে ডিসেম্বরের ৭-১৮ তারিখ পর্যন্ত চলা পরিবেশ সম্মেলনে উন্নত-উন্নয়নশীল দেশগুলির যে ঐক্যমতের নিরিখে একটা সমাধানের রাস্তায় পৌছান যাবে এরকমটাই ভাবা হয়েছিল। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে কোপেনহেগেনে বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন ব্যর্থ।

প্রত্যাশা অনেক ছিল এই কোপেনহেগেন সম্মেলনকে ঘিরে। উন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির বিভেদ মিটে গিয়ে পরিবেশ রক্ষায় তারা একসাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ২০১২ সালে কিয়োটো প্রোটোকলের সময় মাত্রা শেষ হয়ে যাচ্ছে তার আগে এবার ২০১২ পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনায় উল্লেখযোগ্য কার্যসূচী গ্রহণ করা যাবে। আবহাওয়া ও জলবায়ুর খামখেয়ালি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ও বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে সংঘবদ্ধ প্রাচীর গড়ে তোলা যাবে প্রত্যাশা ছিল আকাশচুম্বী। কিন্তু কিচ্ছুটি হল না। সফল হল না সম্মেলন। কেন হল না তা নিয়ে আলোচনা করবো কিন্তু তার আগে দেখে নিই ঠিক কোন পরিস্থিতিতে এবারের সম্মেলন শুরু হয়েছিল? অর্থাৎ আগেকার সম্মেলনগুলির সিদ্ধান্ত, পরিবেশ রক্ষায় গৃহীত ব্যবস্থাদির সীমারেখা এবং তা মান্য কতটা করেছে বিভিন্ন দেশ বা কার্বন নিঃসরণে কোন দেশ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা একটু জেনে নিলে বুঝতে সুবিধে হবে। ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আই পি সি সি) -এর সতর্কবার্তা অনুযায়ী ১৯৯০ সাল নাগাদ বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড যে পরিমাণে মিশত, ২০২০ সালের মধ্যে তার ২৫ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ কমিয়ে আনা। কিন্তু মূল লক্ষ্য ছিল ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন ৫০ শতাংশ কমানো। এই পরিবেশ বাঁচানোর জন্য কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমানোর চেষ্টা তো সেই কবে থেকেই চলছে। ১৯৭২ সালে স্টকহলম সম্মেলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ রক্ষায় পথ চলা শুরু করেছিল, তারপর ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোর বসুন্ধরা সম্মেলন এবং তারপর বহু চর্চিত কিয়োটো প্রোটোকল।

১৯৯৭ সালে কিয়োটো প্রোটোকলে ঠিক হয়েছিল উন্নত দেশগুলিকে ২০০৮-১২ সালের সময়সীমার মধ্য কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের মাত্রা ১৯৯০-এর মাত্রায় তুলনায় ৫ শতাংশ কমাতে হবে। এই চুক্তিতে আমেরিকা স্বাক্ষর করেনি তার কারণ ছিল ভারত ও চীনকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় রেখে এই চুক্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। আমেরিকার যুক্তি ছিল চীন, ভারত উন্নয়নশীল দেশ হলেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন খুব দ্রুত লয়ে ঘটছে তাই কার্বন নির্গমনের মাত্রা কমাবার দেশগুলির তালিকায় তাদেরকে রাখতে হবে। কিন্তু তা না হওয়ায় আমেরিকা বেঁকে বসেছিল। কিন্তু ঘটনা এই যে ৫ শতাংশ কমার বদলে নির্গমন বরং বেড়েছে ১৬ শতাংশ।

আসলে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ার ঘটনা তো একদিনের নয়। এই গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির রমরমায় গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর মত পৃথিবী বিধ্বংসী পরিবেশগত বিপদ কিংবা তার ভয়ঙ্কর ফলাফল আসলে অনেকদিনের সম্মিলিত ফল। প্রায় দুশো বছর ধরে শিল্পায়ন (বিশেষত উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে), তাদের উন্নত জীবনযাপন, মাথাপিছু শক্তি ব্যবহার (বিশেষত চিরাচরিত শক্তি যেমন, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, কাঠ ইত্যাদি) ও কার্বন নির্গমনের হার বেশী। শুধু বেশী নয়, অনেক বেশী একটি ছোট্ট পরিসংখ্যান দিলে বোঝা যাবে। ভারতের সবচাইতে ধনবান ১০ শতাংশ মানুষও আমেরিকার দরিদ্রতম ২০ শতাংশ মানুষের চেয়ে কম গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন করে। আর ঠিক এই জন্যই রাষ্ট্রসংঘ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উন্নত দেশগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। ঠিক এই জায়গা থেকেই এবারের সম্মেলন শুরু হয়েছিল। কারণ কার্বন নিঃসরণে আইনি নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি আরো জোরদারভাবে প্রয়োগ করতে চাইবে রাষ্ট্র সংঘ, যেহেতু রাষ্ট্রসংঘই সব দেশকে একসূত্রে বাঁধার আপাত অসম্ভব কাজকে কাঁধে তুলে নিয়েছে।

কিন্তু মজাটা হল এই যে, এবারের সম্মেলনে শুধুমাত্র আমেরিকাই আইন বাধ্যবাধকতার প্রতিবাদ করল না বা ওজর আপত্তি তুলল না প্রতিবাদ করল ভারত, চীনের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিও। কারণ কেউই নিজেদের সার্বভৌমিকতা বিপন্ন করে আইনি নিষেধাজ্ঞার শৃঙ্খলে বাঁধা

এরপর 5 পাতায়

কোপেন হেগেন ছাড়িয়ে মেক্সিকো

1 পাতার পর

পড়তে চাইছে না। কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রতিটি দেশেরই আলাদা আলাদা করে নিজস্ব মতামত আছে। ভারতের ক্ষেত্রে বিষয়টি হল এরকম ভারতবর্ষ একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে উন্নয়নের অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে। ঠিক এই মুহূর্তেই যদি সেই নিষেধাজ্ঞায় যে সামিল হয় তাহলে তার উন্নতির সমূহ সম্ভাবনাকে জলাঞ্জলি দিয়েই সামিল হতে হবে। কারণ কম কার্বন নিঃসরণ মানে তো কম শক্তির ব্যবহার। আর কম শক্তির ব্যবহার মানে তো কম অর্থনৈতিক কার্যাবলী। আর তাই যদি হয় তাহলে তো ভারতবর্ষের উন্নয়নই স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাই পরিবেশ মন্ত্রী জয়রাম রমেশ থেকে শুরু করে মায় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং পর্যন্ত একই মত পোষণ করেছেন করছেন। আর চীনের ক্ষেত্রে বিষয়টি হল তারা আমেরিকার কুনজরেও পড়তে চায় না আবার এশিয়া এবং দঃ পূর্ব এশিয়ার কর্তৃত্বও ছাড়তে চায় না তারা কখনও আমেরকার পথে পা হেঁটেছেন কখনও আবার ভারতের পথে পা মিলেয়েছে। অর্থাৎ এবারের বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি সবাই নিজের নিজের কোলে ঝোল টানতে ব্যস্ত।

উষ্ণায়ণ নিয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আপাতত সমান্তরাল তিনটি লাইন বর্তমান। প্রথমটি হল, কিয়োটো প্রোটোকল পরবর্তী পর্বে ইউরোপিয়ান পর্বে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলি যাওয়ার চেষ্টা করছে এবং সূত্র খুঁজছে আমেরিকাকে কিভাবে সেই সিদ্ধান্তের পক্ষে আনা যায়। দ্বিতীয়টি, ভারত, ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার লাইন। বক্তব্য এইরকম — যেহেতু উন্নত দেশগুলি সবচাইতে বেশী কার্বন নির্গমন করে তাই কার্বন নিঃসরণের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে তাদেরকেই মূল দায়িত্ব নিতে হবে। আর তৃতীয়টি হল, এশিয়া প্যাসিফিক-এর অন্তর্গত ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জগুলির বক্তব্য যেহেতু পৃথিবীর অবস্থা বিপজ্জনক তাই সবাইকেই কার্বন ইনটেনসিটি বা কার্বন ঘনত্ব কমাতে হবে। এছাড়া অবশ্য বলিভিয়ারও একটি গুরুত্বপূর্ণ মত আছে।

সম্মেলনের শুরুতেই একটি আশঙ্কা করা হয়েছিল। সেটি সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। আসলে কার্বন ক্রেডিট বা কার্বন ব্যবসা পরিবেশ রক্ষায় সমস্ত দেশের ঐক্যমতের ক্ষেত্রে একটি প্রধান সমস্যা। কার্বন ক্রেডিট কি? যে সমস্ত দেশ বেশী পরিমাণে কর্বিন নির্গমন করে বা করছে তারা কার্বন ক্রেডিট করবে সেই সমস্ত দেশ থেকে যারা কার্বন কম নিঃসরণ করে। এবং কনসেপ্ট টি হল যে সেই প্রাপ্ত অর্থ উন্নত দেশগুলির সার্বিক উন্নয়নের কাছে লাগানো হবে। বিশ্বজুড়ে শুরু হয়ে গেল কার্বন বাণিজ্যের ব্যবসা। বাতাসের কার্বন কিংবা বাতাসে কার্বন কমাতে হবে এই অছিলায় বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দূষণ সৃষ্টির অগ্রগণ্য নানাবিধ সংস্থাই ভীষণ পরিমাণে উৎসাহী হল এই কার্বন বাণিজ্য ব্যবসায়। মজার কথা হল যদি আইনি স্বীকৃতি থাকে কোন ব্যবসায় তাহলে তো আর তা করায় কোন বাধা থাকে না। তাই কিয়োটো প্রোটোকলে বৈধতা পাওয়া কার্বন বাণিজ্য মূলত এক লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হল। খুলে গেল কার্বন বাজারের জন্য নতুন স্টক এক্সচেঞ্জ। মূল ব্যাপারটি গিয়ে দাঁড়ালো এইখানে যে বিশেষত উন্নত দেশগুলি কিংবা বহুজাতিক সংস্থা তারা মাত্রাতিরিক্ত কার্বন দূষণও ঘটানো আবার কার্বন ক্রেডিট কিনে নিয়ে নিজেদের পরিবেশ বন্ধুও প্রতিপন্ন করলো। অতএব পরিবেশ রক্ষা চুলোয় যাক কিন্তু নিজেদের সীমাহীন লাভ, অর্থনৈতিক অগ্রসরতা ইত্যাদি যেন বজায় থাকে। সবাই যদি নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত থাকে তাহলে মতানৈক্য অবশ্যম্ভাবী। একসময় তো অবস্থা এমনও হয়েছিল যে, সম্মেলনের চেয়ারম্যান ডেনমার্কের কোনি হেডেগার্ড ইস্তফা পর্যন্ত দিয়েছিলেন। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, মতভেদ ইত্যাদির মধ্যে শেষ হওয়া সম্মেলনে ঠিক হল কোপেনহেগেনে তো সম্ভব হল না ২০১০ এ মেক্সিকোতে আবার বসা হবেই যখন সেখানেই না হয় ঠিক হবে পরিবেশ রক্ষার গতিপ্রকৃতি।

অতএব বিষয়টি যেন হেলাফেলার। কেমন একটা দায়সারা গোছের অ্যাপ্রোচ। সবাই নিজের নিজের স্বার্থের কথা ভাবছে, অথচ সামগ্রিকভাবে পরিবেশ রক্ষার কথা ভাবছেই না। বলা যায় পরিবেশ বন্ধু হবার ভনিতা করছে। রাষ্ট্রসংঘও এখানে চূড়ান্ত অসহায়। তার প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ নজরদারি সত্ত্বেও সম্মেলন থেকে সম্মিলিত ফল এককথায় শূন্য। এতদিন তাও একটা আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল। তা যদি নাই থাকে তাহলে তো দূষণ ঘটার জন্য কোন বাধাই থাকলো না। পরিবেশ তখন একেবারে পিছনের সারিতে চলে যাবে। বাড়তে থাকবে দূষণ, গ্লোবাল ওয়ার্মিং। প্রচুর সম্পদ সম্পত্তি নষ্ট হবে, কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের বাড়বাড়ন্ত দেখা যাবে, জীববৈচিত্র্য রক্ষাই বিশালাকার এক সমস্যা হিসেবে দেখা দেবে (যদিও এখনই এই অবস্থাটি ভীষণই ভয়াবহ)।

আর আমরা অর্থাৎ শুধু মানব সম্প্রদায় নয়, গোটা পৃথিবীটাই চলে যাবে ধ্বংসের মুখে। রাষ্ট্র নায়কদের সদিচ্ছার অভাবে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি পিছিয়ে যেতে থাকবে অনন্তকাল ধরে আর এগিয়ে আসতে থাকবে আমাদের নিশ্চিহ্ন হবার সমূহ সম্ভাবনা। তাই রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিকদের উপর ভরসা না করে নিজেরা আমরা যারা মানুষ তারা পরিবেশ সচেতন হই আর ছোট্ট ছোট্ট পদক্ষেপেই পরিবেশ প্রহরী হয়ে উঠি। কোপেনহেগেন ব্যর্থ, মেক্সিকোতেও মনে হয় না কিছু হওয়া সম্ভব হয়তো বা কোনদিনও মিলিত সিদ্ধান্ত হবে না। কারণ পরিস্থিতি বদল হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

— তুহিন শুভ্র মণ্ডল, ৯৭৩৩২২৮৯৬৬

ঋণ স্বীকার ঃ

১। যুধাজিৎ দাশগুপ্ত, লেখক, দেশ,

২। নব দত্ত, দৈনিক স্টেটসম্যান,

৩। আনন্দবাজার পত্রিকা

মুড়িতে ইউরিয়া

1 পাতার পর

দ্রবণে। এই ফাঁকে জানিয়ে রাখি, শুধু মুড়িতে নয়, বড় বড় পুকুর, ভেড়িতে, ফসলের মাঠে পেল্লাই সাইজের মাছ, বড় বড় পুষ্ট কলা, ফল পেতেও হরদম ব্যবহার চলছে এই ইউরিয়া। ইউরিয়া ব্যবহার করলে কম দিনের মধ্যে মাছ বেড়ে ওঠে। কলা, অন্যান্য ফল পুষ্ট হয় বেশি; পাকেও তাড়াতাড়ি। ইউরিয়া দিয়ে মুড়ি ভাজা খেলে বেশি ক্ষতি হয় যকৃত (Liver) আর বৃক্কের (Kidney)। ইউরিয়ার এক শতাংশ দ্রবণে মুড়ি ভাজলে তার প্রায় সত্তর শতাংশ ঢুকে যায় ভাজা মুড়িতে। এটা পরীক্ষায় প্রমাণিত। তাহলে দেখা যাচ্ছে দিনে ২০০ গ্রাম মুড়ি খেলেই ১৪০০ মিলিগ্রাম ইউরিয়া শরীরে ঢুকছে। এমনিতেই বিপাকীয় বর্জ্য হিসেবে শরীরে কিছুটা ইউরিয়া তৈরি হয়। এই ইউরিয়াকে কিডনি ছাকনির মতো ছেঁকে মূত্রের সাহায্যে বাইরে বের করে দেয়। ইউরিয়া পুরুষের অণ্ডকোষের সেমিনিফেরাস টিবিটলকে প্রভাবিত করে সন্তান উৎপাদন ক্ষমতাকে ব্যাহত করে বলে বৃক্কই রক্ত থেকে এই ইউরিয়াকে প্রস্রাবের সঙ্গে শরীরের বাইরে বের করে দেয়। কিডনি জখম হলেই তা রক্ত থেকে ইউরিয়া বের করতে না পারার জন্য রক্তে ইউরিয়ার মাত্রা বেড়ে গিয়ে শরীরের সর্বনাশ করে দেয়। ইউরিয়া-সমৃদ্ধ মুড়ি পেটে গেলে অতিরিক্ত ইউরিয়া শরীরে এই বিপত্তিটাই ঘটায়। অর্থাৎ এই অতিরিক্ত ইউরিয়া শরীর থেকে বের হওয়ার সুযোগ না পেয়ে বৃক্কের স্বাভাবিক কাজের বিঘ্ন ঘটায়। এর সাথে সাথে লিভার বা যকৃতেরও সমস্যা বাড়ায়। সুতরাং ধবধবে সাদা বড় মুড়ি খেয়ে আমরা ধীরে ধীরে নিজেদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছি। শহরে মুড়ির চেয়ে গ্রামে ভাজা মুড়ির একচ্ছত্র আধিপত্য থাকায় এখনকার দিনে গ্রামে ভেজালের মাত্রা আরও বেশি। সুতরাং সাবধান। পঃ বঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর বেশ কয়েকবছর আগে ইউরিয়া সমৃদ্ধ মুড়ি সনাক্তকরণের একটি উপায় বের করেছেন। পাঠকদের স্বার্থে উপায়টি জানাচ্ছি — দুই মঠো মুড়ি পরিষ্কার পাত্রে নিয়ে ৫০ মিলি লিটার ফুটন্ত জলে তা মিনিট পাঁচেক ক্রমাগত নাড়তে হবে। তারপর সেই জল ছেঁকে অন্য পাত্রে নিয়ে দুই চামচ অড়হড় ডালের গুঁড়ো তাতে যোগ করতে হবে। ৫ মিনিট পর একটি লাল লিটমাস ঐ মিশ্রণে ডোবালে যদি নীল রঙের হয় তবে বুঝতে হবে মুড়িতে ইউরিয়া আছে। এতকিছু ঝামেলার মধ্যে যারা যেতে না চান, তারা ফুলকো সাদা মুড়ি পরিত্যাগ করে সাবেকি লালচে, ছোট মুড়ি কিনে খান। সব ক্রেতারা এই ধরনের মুড়ির ওপর ভরসা রাখলে দেখবেন বাজারে ধরধবে সাদা মুড়ি একদিন ভ্যানিশ।

শেষ করার আগে মুড়ি সংক্রান্ত দু-একটি তথ্য দিতে চাই। মুড়ি একধরনের সিদ্ধ চালে তৈরি হয়। সেদ্ধ চাল দুবার সেদ্ধ করা হয়। প্রথমবার ধান ১ বা ২ দিন জলে ভিজিয়ে সিদ্ধ করার পর, ফের একদিন জলে ভিজিয়ে সেদ্ধ করে রোদে শুকিয়ে ভেনে নেওয়া হয়। এটাই মুড়ির চাল হিসেবে সমধিক প্রচলিত। ধান ভানা হয় কলে অথবা ঢেঁকিতে ছেঁটে। কলে ছাঁটা চালের চেয়ে ঢেঁকিতে ছাঁটা চালে শস্যের বহিঃস্তরটি কম অপসারিত হয়। ঢেঁকিতে ছাঁটা ও কলে ছাঁটা চালে যথাক্রমে কার্বোহাইড্রেট প্রায় ৭৮ শতাংশ ও ৭৯.৪ শতাংশ; স্নেহ পদার্থ ১.৭ শতাংশ ও ০.৩ শতাংশ; অজৈব লবণ (ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি) ১.১ শতাংশ ও ০.৪ শতাংশ; দুষ্পাচ্য তন্তু ০.২ শতাংশ ও ০.৬ শতাংশ; অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড ও জলীয় অংশ থাকে। চালে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স প্রচুর থাকলেও চাল যখন ভাজা হয় তখন চালের জলীয় অংশের পুরোটা উবে যায়, ভিটামিনের পরিমাণ ('ভিটামিন-সি' পুরোটাই) অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়, কার্বনের পরিমাণ কিছুটা বাড়ে আর স্টার্চ ফুলে মুড়িতে পরিণত হয়। এইজন্য মুড়িতে ভিটামিন, খনিজ দ্রব্যের যে অভাব হয়, ভাতের ক্ষেত্রে ততটা নয়। যেহেতু কলে ছাঁটা চালের ভ্রূণস্তরটি চাল হতে বেশি পৃথক হয়, তাই এই চালে ভিটামিন ঢেঁকিতে ছাঁটা চালের তুলনায় কম থাকে (অজৈব লবণ ও ভিটামিন প্রধানত বহিঃস্তর ও ভ্রূণে থাকে) আর মুড়ির চাল বা যেকোন সিদ্ধ চাল দুইবার সেদ্ধ করায় অনেক কমে যায়। এরপর ভাজার ফলে ভিটামিন ও জলীয় অংশ একদমই থাকে না। আমাদের সুষম খাদ্যের দরকার। সুষম খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে দৈনন্দিন যতটা শ্বেতসার, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, খনিজ লবণ, ভিটামিন ও জল প্রয়োজন হয় তা মুড়িতে একদমই পাওয়া যায় না। তাই পূর্ণবয়স্ক মানুষকে বাঁচতে হলে শুধুমাত্র মুড়িতে চলবে না। অনেককে বলতে শোনা যায় শুধুমাত্র মুড়ি খেয়ে দিন কাটাবো, তাদের ক্ষেত্রে এই সাবধানতা জরুরি। তার ওপর মুড়িতে ইউরিয়া থাকলে শরীরের অবস্থাটা কী হবে বুঝতেই পারছেন। অন্যদিকে হৃদযন্ত্রের সমস্যা, ব্লাডপ্রেসারে যারা ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে বেশি নুনের মুড়ি ক্ষতিকারক। তাদের ক্ষেত্রে বাজারের চলতি মুড়ির মধ্যে থেকে খুব কম নুনের (বা নুন ছাড়া) মুড়ি খাওয়াইতো বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ডায়ারিয়া হলেও অনেকে মুড়ি ভেজানো জল খেয়ে তৃপ্ত হন। তাদের ধারণা এতে নুন-সোডা মেশানো আছে তাই এই জল অম্ল নাশক। কিন্তু তাদের ধারণা ভুল। এই সোডা পাকস্থলির হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে খুব সামান্য প্রশমিত করলেও, তা সাময়িক এবং তা পুরোপুরিভাবে পারে না। এর চেয়ে বেশি উপকারী সামান্য নুন চিনি মেশানো জল বা ও.আর.এস। তাই যারা ভাবেন মুড়ি ভেজানো জল অম্বল সারায়, সেই ধারণার পেছনে বিজ্ঞান নেই ছিঁটেফোঁটাও।

— তুষারকান্তি গলুই, ৯৬৩৫৯৩১৩৬২

বইমেলায় বিজ্ঞান অন্বেষক

কোচবিহার জেলা বইমেলা (১১ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি, ২০১০), হলদিবাড়ি বইমেলা (২৫ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি, ২০১০) ও কলকাতা পুস্তকমেলায় (২৭ জানুয়ারি থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি, '১০) বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশনার পক্ষ থেকে বিজ্ঞান মনস্কতার পত্রপত্রিকা, পুস্তিকা সহ স্টলের/টেবিলের) আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিটি পুস্তকমেলার স্টলে পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকার চাহিদা ছিল যথেষ্ট। বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থার কর্মীরা পুস্তক মেলার স্টলে দায়িত্ব নিয়ে পাঠক ও অন্যান্য আগ্রহীদের সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্কতায় বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে পরিকল্পনা করেন।

তিনটি মধ্যমার সাহায্যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের দ্বিতীয় (বিকল্প) পদ্ধতি

কমল বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৭/এ, সেন্ট্রাল রোড, ফ্ল্যাট ৩/এ, যাদবপুর, কল-৩২

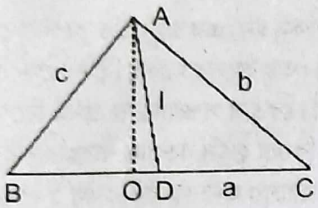

মনে করি, △ABC -র মধ্যমাত্রায় AD (= l), BE (=m) ও CF (=n)। এখানে BC = a, AC = b ও AB = C

AO ⊥ BC অঙ্কন করা হল।

প্রমাণ ঃ - ∵ △ACD -এর ∠ADC স্থূলকোণ (> সমকোণ 0)

$\therefore AC^2 = AO^2 + OC^2 = AO^2 + (OD + DC)^2$

$= AO^2 + OD^2 + DC^2 + 2OD.DC$

$= AD^2 + DC^2 + 2OD.DC$

আবার, ∵ △ADB - এর ∠ADB সূক্ষ্মকোণ (< সমকোণ O)

$AB^2 = AO^2 + BO^2$

$= AO^2 + (BD^2 - OD^2)$

$= AO^2 + BD^2 + OD^2 - 2BD.OD$

$= BD^2 + AD^2 - 2BD.OD$

$\therefore AB^2 + AC^2 = 2DC^2 + 2AD^2 + 2DC.OD - 2DC.OD$

[∵DC = BD]

$= 2DC^2 + 2AD^2$

$= 2\left(\frac{1}{2} BC\right)^2 + 2AD^2$

$= \frac{1}{2} BC^2 + 2AD^2$

$\therefore 2AB^2 + 2AC^2 = BC^2 + 4AD^2$

$\therefore 2AB^2 + 2AC^2 - BC^2 = 4AD^2$

অর্থাৎ $2C^2 + 2b^2 - a^2 = 4l^2$ ..... (i)

অনুরূপে, $2C^2 + 2a^2 - b^2 = 4m^2$ ..... (ii)

এবং $2a^2 + 2b^2 - C^2 = 4n^2$ ..... (iii)

(i) + (ii) + (iii) করে পাই

$3(a^2 + n^2 + c^2) = 4(l^2 + m^2 + n^2)$ ..... (iv)

আবার, (i) হতে আমরা লিখতে পারি,

$2(a^2 + b^2 + c^2) - 3a^2 = 4l^2$ ..... (v)

∴ (iv) ও (v) হতে পাই,

$2 \times \frac{4}{3} (z^2 + m^2 + n^2) - 3a^2 = 4l^2$

বা, $a^2 = \frac{4}{9} (2m^2 + 2n^2 - l^2)$

$\therefore a = \frac{2}{3} \sqrt{(2m^2 + 2n^2 - l^2)}$ একক $= \frac{2}{3} X$ একক

অনুরূপে, $b = \frac{2}{3} \sqrt{(2n^2 + 2l^2 - m^2)}$ একক $= \frac{2}{3} Y$ একক

এবং $c = \frac{2}{3} \sqrt{2m^2 + 2l^2 - n^2}$ একক $= \frac{2}{3} Z$ একক

$\therefore$ △ABC - এর ক্ষেত্রফল $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ ব.একক

$= \sqrt{\left[\frac{1}{3}(X + Y + Z) \times \frac{1}{3}(X + Y - Z) \times \frac{1}{3}(Y + Z - X) \times \frac{1}{3}(Y + Z - Y)\right]}$ ব.একক

$\left[\because s = \frac{a+b+c}{2} = \frac{1}{3}(X + Y + Z)\right]$

$= \frac{1}{9} \times \sqrt{[(2YZ)^2 - (X^2 - Y^2 - Z^2)^2]}$ ব.একক (বিশ্লেষণ করে পাই)

আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানবর্ষ উদ্‌যাপন

জ্যোতিষ নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞান চাই

৩১ ডিসেম্বর, ২০০৯ নীলকুঠি ওয়েলফেয়ার অরগানাইজেশন ফর হিউম্যান ডেভেলপম্যান্ট, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ও বিজ্ঞান অন্বেষক-এর যৌথ উদ্যোগে ৩১ ডিসেম্বর সংস্থার পিলখানা রোডের কার্যালয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'জ্যোতিষ নয় জ্যোতির্বিজ্ঞান চাই' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় NWOHD -এর পক্ষে শঙ্কর নারায়ণ দাস জ্যোতির্বিজ্ঞান বর্ষ উদ্‌যাপনের গুরুত্বের কথা আলোচনা করেন।

বিজ্ঞানকর্মী জয়দেব দে জ্যোতিষশাস্ত্র যে আদৌ বিজ্ঞানভিত্তিক নয়, সে বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। জ্যোতিষীরা রাহু ও কেতু-কে গ্রহরূপে কল্পনা করে যেভাবে ভাগ্যগণনা করেন, আসলে মহাকাশে রাহু ও কেতু নামে কোন গ্রহ আদৌ নেই। এছাড়া জ্যোতিষীরা যেভাবে হস্তরেখা দেখে ভাগ্য ও অন্যান্য ভবিষ্যৎবাণী করে থাকেন সেগুলি পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক। এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রী দে জানান, শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়া ও অভ্যাসগত কারণেই মানুষের আলাদা আলাদা হস্তরেখা তৈরী হয় এর সঙ্গে মানুষের ভাগ্য বা কল্যাণের কোন সম্পর্ক আদৌ নেই। জ্যোতিষীরা যেভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মানুষের ভাগ্য-ভবিষ্যৎ-কল্যাণ নিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন এগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করা উচিত।

শ্রী রামকৃষ্ণ ব্লয়েজ হাইস্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী আলোচনাসভায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন। শ্রী চক্রবর্তী বিভিন্ন রত্নের নাম ও উপাদানগুলি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। চুনী আসলে অ্যালুমিনিয়াম ও অক্সিজেন, মুক্তা ও প্রবাল আসলে ক্যালসিয়াম কার্বন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরী। রত্ন ধারণ করলে কোনভাবেই মানুষের কল্যাণ হয় না। বিবেকানন্দের ভাষায় 'মনে এরকম দুর্বলতা এলেই, আমাদের উচিত সুচিকিৎসক দেখিয়ে ভালোভাবে ওষুধ খাওয়া, ভালোপথ্য খাওয়া আর বিশ্রাম করা।' বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর-এর মাধ্যমে আলোচনা সভাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। — সংবাদদাতা

বেতার তরঙ্গের কথা

1 পাতার পর

গুরুত্ব বোঝা গেল তখন যখন জার্মান বিজ্ঞানী হেন্‌রিখ্ রুড্‌লফ্ হার্ৎস (১৮৫৭-১৮৯৪) ১৮৮৮ সালে বেতার তরঙ্গ ট্রান্সমিট করলেন এবং রিসিভ করলেন। হার্ৎস সবচেয়ে ছোট যে বেতার তরঙ্গ উৎপন্ন করতে পেরেছিলেন তার দৈর্ঘ্য ছিল ৬৬ সেন্টিমিটার। হার্ৎসের পরীক্ষাটি যুগান্তকারী। তরঙ্গের কম্পাঙ্কের একক হার্ৎস (Hertz) যা বিজ্ঞানী হার্ৎস-এর নাম থেকেই নেওয়া। বিজ্ঞানী অলিভার যোশেফ্‌লজ (১৮৫১-১৯৪০) হার্ৎসের পরীক্ষাটি আবার করলেন। ১৮৭১ সালে অক্সফোর্ডে তিনি ৯০ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত বেতার সংকেত (Wireless Signal) পাঠাতে সমর্থ হলেন। বেতার তরঙ্গ ধরবার জন্য তিনি একটি ট্রান্সমিটার, একটি রিসিভার এবং কোহেরার নামে একটি নল ব্যবহার করলেন। এই কোহেরার-এর আবিষ্কারক ফরাসী পদার্থবিদ এডাউয়ার্ড ব্রান্‌লি (১৮৪৪-১৯৪০)। তিনি দেখিয়েছিলেন ২৫ মিটার দূরত্বে তৈরী বেতার তরঙ্গ, তার কোহেরারের মধ্যে লোহা বা রূপার কণাগুলিকে একত্রিত করে রাখে এবং তড়িৎপ্রবাহ পাঠায়। ১৮৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) আবিষ্কার করলেন বিশ্বের সর্বপ্রথম সলিড-স্টেট ডায়োড ডিটেক্টর অফ্ ওয়্যারলেস ওয়েভ। বিকিরকের সাহায্যে তিনি ৫ মিলিমিটার থেকে ২৫ মিলিমিটার বেতার তরঙ্গ তৈরী করতে সমর্থ হলেন। ইতিমধ্যে সেন্ট পিটার্সবার্গে প্রথম রেডিও রিসিভার তৈরী হলো। তৈরী করলেন এ.এস. পোপফ (১৮৫৯-১৯০৬)। 'Heinrich Hertz' কথাটিকে ৫ কিলোমিটার দূরত্বে পাঠিয়ে সকলকে চমকে দিলেন পোপফ। গুগলিয়েলমো মার্কনী (১৮৭৪-১৯৩৭) বুঝতে পেরেছিলেন হার্ৎসের তৈরী তরঙ্গকে যোগাযোগের কাজে ব্যবহার করা যাবে। মার্কনী রেডিও ব্যবস্থার মাধ্যমে ৩ কিলোমিটার দূরত্বে টেলিগ্রাম পাঠাতে সমর্থ হলেন। পরবর্তীকালে ৩২ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত বেতার তরঙ্গ পাঠাতে সক্ষম হন। মার্কনী দেখলেন এরিয়ালের উচ্চতা আরো বাড়ালে ওয়্যারলেস সিগনালকে আরো দূরে পাঠানো যাবে। মার্কনী আটলান্টিক অতিক্রম করে নিউফাউন্ডল্যান্ডে পৌঁছলেন। সেখানে একটি এরিয়াল স্থাপন করে ইংল্যান্ডের কর্নওয়াল থেকে পাঠানো বেতার তরঙ্গ ধরতে সক্ষম হলেন। ১৯০১ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখে 'S' বর্ণ নির্দেশক তিনটি টেলিগ্রাফি ডট গ্রহণ করতে সক্ষম হলেন। এই টেলিগ্রাফি বার্তা প্রেরণের মধ্য দিয়ে বেতারের সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক প্রয়োগ ঘটল। ১৯০৬ সালে কানাডার রেজিল্যান্ড ফেসেনডন (১৮৬৬-১৯৩২) এবং তাঁর বন্ধু আলেকজান্ডারসন বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে ৩২০ কিলোমিটার দূরত্বে কথা এবং মিউজিক পাঠাতে সক্ষম হন। এর জন্য উচ্চ কম্পাঙ্কের অলটারনেটর ব্যবহার করা হয়েছিল। অল্পকালের মধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেতার তরঙ্গের ব্যবহার শুরু হলো। বেতার সম্প্রচারের প্রথম দিকে লো-স্পিড টেলিগ্রাফির জন্য ৩-৩০ কিলো হার্ৎস কম্পাঙ্ক ব্যবহার করা হতো। দূরবর্তী স্থানে বেতার তরঙ্গ প্রেরণের জন্য পরবর্তীকালে ১৫০০ কিলো হার্ৎস কম্পাঙ্ক ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন রেডিও ব্যান্ডের কথায় আসি। খুব বেশি দূরত্বে যোগাযোগের জন্য ৩০০-৩০০০ হার্ৎসের ভয়েস ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়। সম্রচার ও রেডিও নেভিগেশনের কাজে ৩-৩০ কিলো হার্ৎস কম্পাঙ্কের ভেরি লো ফ্রিকোয়েন্সি (VLF) ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়। FM সম্রচার, মোবাইল, রেডিও, টিভি সম্প্রচারের জন্য ৩০-৩০০ মেগা হার্ৎস কম্পাঙ্কের ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি (VHF) ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়। মাল্টিচ্যানেল টেলিফোনি, র‍্যাডার, উপগ্রহ যোগাযোগের কাজে ৩-৩০ গিগা হার্ৎস কম্পাঙ্কের সুপার হাই ফ্রিকোয়েন্সি (SHF) ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়।

— গোবিন্দ দাস

বিজ্ঞানের প্রসারে ও বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তুলতে বিজ্ঞান অন্বেষক পড়ুন ও পড়ান

উত্তরবঙ্গে যোগাযোগ

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দিশারী সংকল্প (বেলতলা পার্ক), বালুরঘাট, তুহিনশুভ্র মণ্ডল, ৯৭৩৩২২৮৯৬৬

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব, নয়াবস্তি, রাজা রাউত, ৯৪৭৪৪১৭১৭৮

বালুরঘাট, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, ৯৮৩২৪৬৩৪১৬

নীলকুঠি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশান ফর হিউম্যান ডেভেলপ।

✆ 25890019(R), 9433977495

Subrata Das

D.M. Club Member Agent, LICI (Kalyani Branch)

: Residence :

Purbasha, Gokulpur, P.O. Kantaganj- 741250

পত্রিকা সহযোগী সংস্থা ঃ বিজ্ঞান দরবার, কাঁচরাপাড়া, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা, হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, নীলকুঠি ওয়েল ফেয়ার অরগানাইজেশন ফর হিউম্যান ডেভেলপম্যান্ট, কোচবিহার, জংশন ওয়েলফোর অরগানাইজেশন, আলিপুর দুয়ার জং, দিশারী সংকল্প বালুর ঘাট, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, মাদারিহাট, জলপাইগুড়ি, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব, বলাগড় গণবিজ্ঞান সমিতি, দমদম সায়েন্স ক্লাব, কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, যাদবপুর।

যোগাযোগ — বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো ঃ কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৮৪৬০৭৭৭, ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩০০০৯২ ।

সম্পাদক মণ্ডলী — সুরজিৎ পাল, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, সলিল কুমার শেঠ, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলি।

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা থেকে মুদ্রিত ।

সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার। (ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)

E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in